বাধ্যতামূলক কমপিউটার শিক্ষা

মোস্তাফা জব্বার

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে আইসিটি খাতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের হার ৩০ শতাংশে ও টেলিঘনত্বের হার ৭০ শতাংশে উন্নীত করা, সব ইউনিয়নে ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলিসেন্টার বা ই-সেন্টার স্থাপন, সব ডাকঘরে কলসেন্টার স্থাপন এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে কমপিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শতকরা ৩০ ভাগ ঘরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছানোর কাজটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। মনে হয়, টেলিঘনত্ব আগামী চার বছরে শতকরা ৭০ ভাগ ছাড়িয়ে যাবে। বর্তমানে জনসংখ্যার অর্ধেকের মোবাইল সংযোগ রয়েছে। বিগত আড়াই বছরেই প্রায় তিন কোটি নতুন সংযোগ দেয়া হয়েছে। আগামী চার বছরে আরও তিন কোটি নতুন সংযোগ মোটেও অসম্ভব নয়। সব ইউনিয়নে ই-সেন্টার বা টেলিসেন্টার এরই মাঝে স্থাপিত হয়ে গেছে। এগুলো চলুক বা না চলুক যন্ত্রপাতি তো ইউনিয়নে চলে গেছে। মোবাইলের সহায়তায় সেসব স্থানে ইন্টারনেট সংযোগও দেয়া হয়েছে। শুধু বাকি থাকছে সব ডাকঘরে কলসেন্টার স্থাপন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কমপিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। ডাকঘরে কলসেন্টার স্থাপন করাও শুধু সময়ের ব্যাপার। সরকার ইচ্ছে করলে টাকা বরাদ্দ দিলেই এ কাজটিও সহসাই করা যাবে। ইন্টারনেট চালু ছাড়াও আরেকটি চ্যালেঞ্জের বিষয় বাধ্যতামূলক কমপিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

উল্লেখ্য, আমাদের কাছে যেটি ২০১৫ সালের চ্যালেঞ্জ, আমাদের পাশের দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এরই মধ্যে সে কাজটির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কমপিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এই কাজটি করার জন্য আমাদের তদবির অনেক আগে থেকেই। সেই ১৯৯২ সালে এই বিষয়ের প্রথম কাজ শুরু হয়। সিলেবাস প্রণয়নের সময় থেকেই আমরা এই বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করার জন্য অনুরোধ করে আসছি।

১৯৯৬ সাল থেকে নবম-দশম শ্রেণীতে কমপিউটার শিক্ষা নামের একটি বিষয় পাঠ্য হয়। বিষয়টি থাকে ঐচ্ছিক। এই ঐচ্ছিক আয়োজনটাও খুবই জটিল। এটি এমন যে, কেউ যদি বিজ্ঞান পড়তে চায় যেমন জীববিদ্যা বা উচ্চতর গণিত, তবে আর তারা কমপিউটার বিষয় নিতে পারে না। ফলে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়টিকে নিতেই পারে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর্টসের ছাত্রছাত্রীরা বা কমার্সের ছাত্রছাত্রীরা বিষয়টি পড়ে থাকে।

'৯২-৯৪ সময় পরিধিতে বিষয়টির সিলেবাস যখন তৈরি করা হয় তৈরি, তখন বারবার এ কথাটি বলার চেষ্টা করেছি, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এর পাঠক্রমতৈরি করুন। কিন্তু ১৯৯৬ সালে এই বিষয়টি ডস অপারেটিং সিস্টেম ও বেসিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি ডস ও তার অ্যাপ্লিকেশনগুলো শেখার জন্য ছেলেমেয়েদেরকে বাধ্য করেছিল। এরপর ভাগ্যক্রমে এর পাঠক্রম আপডেট করা সম্ভব হয়। নতুন করে আমি বইটি আপডেট করতে সক্ষম হই। ১৯৯৮ সালে যখন এই বিষয়টি এইচএসসিতে পড়ানো শুরু হয় তখনও এর সিলেবাস ছিল পুরনো ধাঁচের। কলেজগুলোতে এই বিষয় পড়ানোর অবস্থাও স্কুলগুলো থেকে ভালো নয়। বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরও এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে বাধ্যতামূলক কমপিউটার শিক্ষা : সরকার ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে আইসিটি নামের একটি নতুন বিষয়কে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করছে। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারের এই সিদ্ধান্ত মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে একসাথে প্রায় ১৩ লাখ ছাত্রছাত্রী বাধ্যতামূলকভাবে এই বিষয়টি পড়বে। মনে হয়, এর পরের বছর সপ্তম ও তার পরের বছর অষ্টম শ্রেণীতে এই বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করার ফলে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের কমপিউটার লিটারেসির হার বাড়বে।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠক্রম : ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠক্রমটি কার্যত এই বিষয়ের সূচনা পাঠক্রম হয়েছে। আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল এবং বিজয় ডিজিটাল স্কুলের প্রাক প্রাথমিক স্তরে (প্লে-গ্রুপ, নার্সারি ও কেজি) কমপিউটারের যেসব বিষয় পড়ানো হয়, ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠক্রমটি তারচেয়েও দুর্বল। তৃতীয় শ্রেণীতে যা পড়ানো হয়, তা তো বস্তুত নবম-দশম শ্রেণীর পাঠক্রমের মতোই। এই বিষয়ের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠক্রম যারা তৈরি করেছেন, তারা এটি মোটেই ভাবেননি যে ছাত্রছাত্রীরা আকর্ষণীয় বা পছন্দের বিষয়গুলোকে দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে। যাহোক, শেষাবধি ষষ্ঠ শ্রেণীর এই পাঠক্রম অচিরেই প্রথম শ্রেণীতেই পাঠ্য হবে। খুব সঙ্গতকারণেই ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠক্রমকে মনে হয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বা প্রাক প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম। প্রাথমিক পর্যায়ে কমপিউটার শিক্ষা বিষয়টি চালু হলে তার সাথে পাঠক্রমটি সমন্বয় দরকার। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এই বিষয়টি পাঠ করার পর ষষ্ঠ শ্রেণীতে এসে শিক্ষার্থীরা এরচেয়ে অনেক গুণ বেশি শিখতে চাইবে। প্রাথমিকভাবে কমপিউটার বিষয়টি জানার সূচনা হিসেবে এই পাঠক্রমটি চালু হতে পারে। এটি মন্দের ভালো। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে বিষয়টি চালু হওয়ার সাথে সাথে ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী ও প্রাথমিক স্তরের পরবর্তী বিষয়গুলো ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠ্য করতে হবে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে ওয়ার্ড প্রসেসিং এবং অষ্টম শ্রেণীতে স্প্রেডশিট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে তিনটি শ্রেণীতেই তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে কমপিউটার যন্ত্রপাতি পরিচিতি ও তিনটি শ্রেণীতেই নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার এবং ইন্টারনেট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনটি শ্রেণীতে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন খুবই কম। তিন বছরে শিক্ষার্থীর অতি প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মদক্ষতা তৈরি হবে মাত্র তিনটি বিষয়ে। যথা– ০১. ওয়ার্ড প্রসেসিং, ০২. স্প্রেডশিট ও ০৩. ইন্টারনেট। পাঠক্রমের বিস্তারিত বিবরণ অংশটুকু দেখে মনে হয়েছে, গ্রহণ করতে সক্ষম ও অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীদেরকে মূলত একই বৃত্তে ৩ বছর ধরে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কতগুলো অতিগুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় এই পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যেত। পাঠক্রমে সেই কাজটি করা হয়নি।

মনে হয় শিক্ষার্থীদেরকে পাওয়ার পয়েন্ট, গ্রাফিক্স, অডিও-ভিডিও, প্রোগ্রামিংয়ের মৌলিক ধারণা এসব বিষয়ে এই তিন বছরে পরিচিত করা যেতে পারে। পাওয়ার পয়েন্ট তাদের উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজন হবে। সরকার এরই মধ্যে স্কুলে প্রজেক্টর ও ল্যাপটপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব যন্ত্র পাওয়ার পয়েন্টনির্ভর হবে। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য পাওয়ার পয়েন্ট খুবই প্রয়োজনীয় একটি অ্যাপ্লিকেশন। এটি শেখাও খুব কঠিন নয়। আজকাল প্রায় সব মোবাইল ফোনে ক্যামেরা থাকে। ফলে ডিজিটাল ফটোগ্রাফির সাথে এই বিষয়ের গ্রামের ছেলেমেয়েরাও পরিচিত। এদেরকে এসব ছবি সম্পাদনা ও ব্যবহার করা শেখানো উচিত। মোবাইলের বদৌলতেই অডিও এবং ভিডিও'র ব্যবহার এখন প্রতিদিনের ঘটনা। এই সময়ে কিড পিক্স ভিলাক্স ধরনের ছবি আঁকার সফটওয়্যার ও ইন্টারেকটিভ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারও শেখানো উচিত। একই সাথে কমপিউটারের হার্ডওয়্যার সংযোজন করা এবং সফটওয়্যার ইনস্টল করাও পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পাঠক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ইতিহাস বা বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়ার চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে কমপিউটার চালু ও ব্যবহার, ১৯৮৭ সালে কমপিউটারে বাংলা প্রচলন, ১৯৯৬ সালে অনলাইন ইন্টারনেট চালু করা, ১৯৯৮ সালে কমপিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করা এবং ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ঘোষণা করার বিষয়গুলো পাঠক্রমে ঠাঁই পাওয়া উচিত। ▶

যাহোক, সূচনা হিসেবে এই পাঠক্রমকে স্বাগত জানিয়েই আগামী ২০১৩ সালের মধ্যেই পাঠক্রমটি পুনরায় পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ : জানি না ষষ্ঠ শ্রেণীতে ২০১২ সালে কমপিউটার শিক্ষা বিষয়টি চালু করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের কী ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষিভিত্তিক ও ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা পদ্ধতিতে পাস করা স্কুলের বিদ্যমান শিক্ষকেরা কমপিউটার সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখেন না। তারা নিজেরা কমপিউটার ব্যবহারও করেন না। স্কুলগুলোতে কমপিউটার বিষয়ের জন্য আলাদা কোনো শিক্ষকও নেই। এমতাবস্থায় এই বিষয়টি কারা পড়াবেন সেটি সহজেই অনুমেয়। স্কুলের বিজ্ঞান বা অঙ্ক শিক্ষকের বাড়তি দায়িত্ব হতে পারে ক্লাস সিক্সের কমপিউটার ক্লাসটি নেয়ার। কিন্তু অঙ্কের বা বিজ্ঞানের শিক্ষকও কি এই বিষয় পড়ানোর জন্য যা জানা দরকার, তা জানেন? ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যেখানে বই তৈরি হয়নি সেখানে সেই শিক্ষকদের অন্তত পরিচিত করানোর কাজটা কবে হবে? আমাদের একটি প্রবণতা হলো– সব প্রস্তুতি সম্পন্ন না করেই কাজটা করে ফেলা। এ ক্ষেত্রেও তা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এটি নবম-দশম শ্রেণীর মতো একটি অপশনাল বিষয় নয়। এটি একটি বাধ্যতামূলক বিষয় এবং সে জন্য প্রতিটি স্কুলে এই বিষয়ের শিক্ষক থাকা বাঞ্ছনীয়।

ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যবই : ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা আমরা করেছি। এবার একটু বইটির দিকে তাকানো যেতে পারে। এনসিটিবি একটি বই এরই মধ্যে প্রস্তুত করেছে। কে বা কারা এই বই লিখেছেন তা জানা যায়নি। তবে বইটির খসড়া দেখে মনে হয়েছে এর বেশ কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার আছে। বিষয়গুলো খুবই গুরুত্ব বহন করে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুসারে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জাফর ইকবালকে আহ্বায়ক এবং মোস্তাফা জব্বার, মুন্নির হাসান, মোঃ আফজাল হোসেন সারোয়ার, মোঃ মুখলেসুর রহমান ও মোঃ লুৎফর রহমানকে সদস্য করে বইটির পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। গত ১৪ আগস্ট ২০১১ এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১ বিসিসিতে এই কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ড. জাফর ইকবাল নিজে বইটিকে সম্পাদনা করেছেন। ফলে বইটির কিছু জটিলতা নিরসন হয়েছে।

বইটির প্রথম খসড়ায় ওয়ার্ড প্রসেসিং শেখানোর জন্য এমএস ওয়ার্ড ও ওপেন অফিস একই সাথে শেখানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

আমরা জানি, সত্তর দশকে পিসির আবির্ভাবের পর থেকে কমপিউটারের জন্য নানা ধরনের অপারেটিং সিস্টেম প্রচলিত হয়ে আসছে। ১৯৭৬ সালে অ্যাপলের অপারেটিং সিস্টেম তাদের অ্যাপল সিরিজের পিসির মাধ্যমে পার্সোনাল কমপিউটিং জগতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরপর ১৯৮১ সালে আইবিএম পিসির হাত ধরে ডসের জমানা শুরু হয়। সেই থেকে মাইক্রোসফট পিসির অপারেটিং সিস্টেম জগতে দোর্দণ্ড প্রতাপে চলছে। আমি আর আপনি মানি না মানি, দুনিয়ার চিত্রটা এরকমই। এখনও সেই প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। উইকিপিডিয়ার মতে, জুলাই ২০১১-তে পিসির অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে শতকরা ৮৫.৫৪ ভাগ ছিল উইন্ডোজের দখলে। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এটি শতকরা ৮৯ ভাগ পর্যন্ত উঠেছে। এখন এর মাঝে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে উইন্ডোজ এক্সপি। এর মার্কেট শেয়ার শতকরা ৩৬.৪৫ ভাগ। এরপর উইন্ডোজ সেভেনের অবস্থান। এর মার্কেট শেয়ার হলো ৩১.২৬। অন্যদিকে উইন্ডোজ ভিস্তার মার্কেট শেয়ার হলো শতকরা মাত্র ১২.০৯ ভাগ। ধারণা করা যায়, ২০১২ সালে এক্সপিকে হটিয়ে শীর্ষস্থানটি নেবে উইন্ডোজ সেভেন এবং উইন্ডোজ ভিস্তার শেয়ার আরও কমবে। উইন্ডোজের বাইরে ম্যাক ওএসের মার্কেট শেয়ার হচ্ছে শতকরা ৭.২৫ এবং অ্যাপলের আই ওএসের মার্কেট শেয়ার শতকরা ২.৯৮। আই ওএস ব্যবহার হয় অ্যাপলের আইপ্যাডে। লিনআক্স কারনেলভিত্তিক জিএনইউ অপারেটিং সিস্টেমের একই সময়ের মার্কেট শেয়ার হলো শতকরা ১.০২ এবং লিনআক্সভিত্তিক অ্যান্ড্রয়িডের মার্কেট শেয়ার হলো ১.০৫ ভাগ। সিমবিয়ান, ব্ল্যাকবেরি এবং অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেম বাকি মার্কেট শেয়ার দখল করেছে।

(সূত্র : http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems)।

এই হিসাবে মুক্ত সফটওয়্যারের মার্কেট শেয়ার হলো শতকরা মাত্র ২.০৭ ভাগ। যে অপারেটিং সিস্টেমগুলো বিনামূল্যে পাওয়া যায় এবং যা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা যায় এবং এখন যেসব অপারেটিং সিস্টেম গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসেই ভরে গেছে সেগুলো কেনো মাত্র শতকরা দুই ভাগে আটকে আছে। এমনকি লিনআক্সকে ভিত্তি করে তৈরি করা ম্যাক ওএস কেমন করে মুক্ত অপারেটিং সিস্টেমের সাড়ে তিনগুণ বেশি মার্কেট শেয়ার পেল? এসব না বুঝে যদি আমরা মুক্ত সফটওয়্যারের বোঝাটা স্কুলের শিক্ষকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতাম, তবে কাজটি মোটেই ভালো হতো না। সৌভাগ্য যে বইটি এখন একটি জেনেরিক পদ্ধতিতে ওয়ার্ড প্রসেসিং শেখার উপযুক্ত হয়েছে।

বইটিতে বেশ কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। সম্ভবত কারিকুলামকে অনুসরণ করতে গিয়ে এই বিপত্তি হয়েছে। কারিকুলামটি আপডেট করে নিচের বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা উচিত। ক. বইটিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ শব্দটি আছে, কিন্তু এটি কী তার কোনো বিবরণ নেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা বইটিতে থাকা উচিত। কে, কখন ও কিভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করেছে সেটি এই বইতে না থাকার কোনো কারণ নেই। একই সাথে মানব-সভ্যতার বিবর্তনে কৃষি ও শিল্পযুগের পর যে ডিজিটাল যুগে আমরা পৌঁছেছি তার লক্ষণগুলো বিশেষত ডিজিটাল লাইফ স্টাইল সম্পর্কে ধারণা দিয়ে এটি বলা যায় যে ডিজিটাল বাংলাদেশের হাতিয়ার হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি। শিক্ষার্থীরা তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি কেনো শিখবে সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করা যায়। খ. বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ কেমন করে হয়েছে তার একটি পরিচিতিও প্রথম অধ্যায়ে থাকা উচিত। আমরা '৬৪ সালে কমপিউটার আনলাম, '৮৭ সালে কমপিউটারে বাংলা চালু করলাম, আমরা মোবাইল ফোন চালু করলাম, ইন্টারনেটকে অনলাইন করলাম, ওয়াইম্যাক্স চালু করলাম: এসব কেনো করলাম বা কখন করলাম: সেই বিষয়ে ছোট করে দুয়েকটি অনুচ্ছেদ না থাকার কোনো যুক্তি নেই। গ. মাল্টিমিডিয়া অডিও-ভিডিও এবং ইন্টারেকটিভিটি বিষয়টি বইতে অনুপস্থিত। আজকাল কমপিউটার অন করার সাথে সাথে এই যন্ত্রটিকে অডিও-ভিডিও ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপক। এ সম্পর্কে ছোট করে ধারণা দেয়া জরুরি। ঘ. কমপিউটারের বিবর্তনের ইতিহাস ও বিভিন্ন ধরনের কমপিউটার সম্পর্কে ধারণা বইটিতে থাকা উচিত। কমপিউটার কত প্রকারের ও কী কী তা একেবারে শুরুতেই বলা উচিত নয়। ঙ. বইটিতে র‍্যাম, মেমরি কার্ড এসব যন্ত্রকে স্টোরেজ ডিভাইস হিসেবে দেখানো হয়নি। অথচ র‍্যাম ছাড়া কমপিউটার চলে না। মেমরি কার্ড তো সবখানে ব্যবহার হয়। অন্যদিকে নিজের স্টোরেজ ডিভাইস ছাড়াও যে অন্যত্র (যেমন– জি মেইল, ফেসবুক ইত্যাদি) তথ্য রাখা যায়, তার ধারণা দেয়া উচিত। এটি আসলে ক্লাউড কমপিউটিংয়ের প্রাথমিক ধারণা দেবে। চ. কমপিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফেসবুক-টুইটার ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের কথা বলা উচিত। ছ. কমপিউটারের ভাষা তিন প্রকারের (পৃষ্ঠা-২১) এই তথ্যটি বিভ্রান্তিমূলক। এমনকি কমপিউটারের প্রোগ্রামিং ভাষার কথাও যদি এখানে বলা হয়ে থাকে তবে সেটি এভাবে বলা সঠিক নয়। জ. অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করার পদ্ধতি শেখানো উচিত। ঝ. ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের সফটওয়্যারের একটি বিশাল তালিকার কোনো প্রয়োজন নেই। (পৃষ্ঠা-৫০) ওদেরকে এমএস ওয়ার্ড এবং ওপেন অফিস এই দুটি সফটওয়্যারের কথা বললেই হয়। ঞ. ওয়ার্ড প্রসেসরের বাংলা সংস্করণ (বাংলায় মেনু-কমান্ড এসব) দেখানোর প্রয়োজন নেই। এটি ইংরেজি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ট. ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ে বাংলা হরফ কেমন করে লিখতে হয় এবং বাংলা কিবোর্ড কেমন করে ব্যবহার করতে হয় বা যুক্তাক্ষর কেমন করে তৈরি করতে হয় সেটি শেখানো উচিত। ঠ. মেইল ব্যবহার করাও শেখানো উচিত। ড. বইটিতে অনলাইন চ্যাট ও ভিডিও চ্যাট শেখানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমি আশা করব, পাঠক্রম পর্যালোচনার সময় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি শিল্প খাতের সাথে আলোচনা করা হবে এবং ২০১২ সালের পাঠ্যপুস্তকটিকে নতুন করে সাজানো হবে।

ফিডব্যাক : *mustafajabbar@gmail.com*